বাংলা ট্রিবিউন

Print Now

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সামাজিক টানাপড়েন

গোলাম মোরশেদ

প্রকাশিত: ১৬:৩৮, এপ্রিল ২২, ২০১৯ | সর্বশেষ আপডেট: ২১:১১, এপ্রিল ২২, ২০১৯

গোলাম মোরশেদ

বাংলাদেশের বেশিরভাগ নৃগোষ্ঠীই বর্তমানে কোনও না কোনোভাবে মূলধারার সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। বিশেষত যারা নগরে বসবাস করছেন তাদের সাথে মূলধারার সমাজের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ক্রমশ বাড়ছে। জাতি গোষ্ঠীগুলোর 'জাতি পরিচিতির' (এথনিক আইডেনটিটি) প্রথাগত ধারণা ও চর্চার জায়গায় পরিবর্তন হচ্ছে। অতীতে তারা তাদের স্বতন্ত্র ভাষা, চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার, উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান, পরিবারের ধরন, উত্তরাধিকার ব্যবস্থা প্রভৃতি দ্বারা পরিচিত হতো। বর্তমানে নৃগোষ্ঠীদের এই সকল সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলোতে পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে।

নৃগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতির এই পরিবর্তনশীলতা নিয়ে নবীন-প্রবীণদের মাঝে রয়েছে মতভেদ। মোটাদাগে নবীন-প্রবীণ বিভাজনের চেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের মাঝে এই মতভেদ তুলনামূলক বেশি দেখা যায়। সাধারণত শিক্ষিতরা আধুনিক প্রযুক্তি এবং সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের প্রতি বেশি আগ্রহী ও অভ্যস্ত। তারা ঐতিহ্যবাহী চর্চার প্রতিও আকর্ষণ অনুভব করেন, তবে তা প্রাত্যহিক চর্চায় তুলনামূলক কম। নবীন এবং শিক্ষিতদের একটা বড় অংশ তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনে ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাস ও চর্চাকে খুব বেশি ধারণ করছে না।

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে আন্তঃবিবাহের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিষয়টিকে বেশিরভাগ মানুষ নেতিবাচকভাবে দেখে। পূর্বে নৃগোষ্ঠীর কোনও নারী-পুরুষ নিজ সমাজের বাইরে বিয়ে করলে সমাজ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতো। কিন্তু বর্তমানে তার মাত্রা কমে গেছে। পূর্বে যেখানে দোষী সদস্য ও তার পরিবারকে একঘরে করাসহ অন্যান্য শাস্তি প্রদান করতো সেখানে অনেক পরিবারই বর্তমানে এই সম্পর্কগুলোকে মেনে নিচ্ছে। তবে এর হার কম।

প্রবীণরা আক্ষেপ করে বলেন, বর্তমান প্রজন্মের শিশুরা তাদের মাতৃভাষা প্রায় বলতে পারে না বললেই চলে। এইসব ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর প্রায় প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ভাষা ছিল। কোনও কোনও জাতিগোষ্ঠীর আলাদা নামের ভাষা ছিল, আবার কারও ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা না হলেও উচ্চারণগত স্বতন্ত্রতা ছিল। কয়েক দশক আগেও যেখানে এই ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীরা বাংলা ভাষায় কথোপকথনে সাবলীল ছিল না সেখানে বর্তমান প্রজন্ম বাংলা ভাষায় যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য।

২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত পাঁচটি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর শিশুরা (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও ওঁরাও) নিজেদের ভাষায় প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। আবশ্যিক বাংলা ভাষায় পড়াশোনা এবং বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষার চর্চা কমে যাচ্ছে। এমনকি যারা নগরে বসবাস করছে তাদের বাংলা ভাষায় দক্ষতা অন্য বাঙালিদের মতোই দৃশ্যমান। দৈনন্দিন কথোপকথনে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষায় বাংলা শব্দের সংমিশ্রণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বিলীন হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে বাংলাসহ মোট ভাষার পরিমাণ ৪১টি। যার ১৫টিকেই বিপন্ন

ভাষা হিসেবে দেখছেন গবেষকরা। এছাড়া ইতোমধ্যে দেশে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে পুরোপুরি হারিয়ে গেছে এমন ভাষাগুলো হলো রাজবংশী, রাই, বাগদি, কোচ, হদি ও ভালু ইত্যাদি।

একজন প্রবীণ জানান, তার নাতি-নাতনি ঢাকা শহরের এক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশোনা করে। তিনি জানান, সারা বছর শহরে থাকার সুবাদে তারা যেমন গ্রামে আসার সুযোগ পায় না, আবার সারা দিনের পড়াশোনার চাপের কারণে মাতৃভাষা চর্চার সুযোগও পায় না। বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে মাতৃভাষা মোটামুটি বুঝলেও অনর্গল কথা বলতে পারে না। আবার মৌলভীবাজারের একজন মনিপুরি জানান, তার ছেলে বাংলা ভাষায় পারদর্শী না হওয়ায় পরীক্ষার ফলাফলে খারাপ করেছে। এই উভয় সংকটের একটা বিশেষ দিক হলো, বিভিন্ন ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ছেলেমেয়ে ধীরে ধীরে তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

খাবার-দাবারের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় পরিবর্তন রয়েছে। একজন মনিপুরী বলেন, শহরে চাকরি করার সুবাদে তাকে প্রায়ই রেস্টুরেন্টে খাবার খেতে হয়। আর রেস্টুরেন্টগুলোতে সবসময় চাহিদামতো খাবার পাওয়া যায় না। এজন্য তিনি প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের মাংস খেয়ে থাকেন। এই প্রবণতা থেকে সামগ্রিকভাবে না হলেও বেশিরভাগ নৃগোষ্ঠীই তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবারের পরিবর্তে বাইরের খাবারে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে।

আবার বেশিরভাগ নৃগোষ্ঠীর মাঝে মদপান ঐতিহ্যগতভাবে খুব স্বাভাবিক ও প্রাত্যহিক হলেও বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই মদপান এড়িয়ে চলে। শুধু বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছাড়া নিয়মিত মদপানের প্রবণতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এর কারণ নৃগোষ্ঠীর নিজ সমাজের বাইরে মদের সহজলভ্যতা না থাকা, বৃহৎ সমাজের মূল্যবোধ ও অভিভাবকদের বিধিনিষেধ প্রভৃতি। এনজিও চাকরিজীবী একজন গারো বলেন, সমাজে মদপান করে মাতলামি করা যেহেতু অশোভন দেখায় আর ছেলেমেয়েরা যেহেতু বিভিন্ন পরিবেশে মেলামেশা করে এজন্য তিনি ছেলেমেয়েদের মদপান করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তবে অনুষ্ঠানগুলোতে যুবক ছেলেমেয়ে কেউ কেউ মদপান করে থাকে।

পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রজন্ম প্রাত্যহিক জীবনযাপনে ঐতিহ্যবাহী পোশাকের পরিবর্তে সমসাময়িক পোশাকের প্রতি বেশি ঝুঁকছে; শুধু নিজস্ব উৎসবের দিনগুলোতে তারা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করে।

শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তারা আদি পেশা, যেমন- জুম চাষ, কৃষিকাজ, কুটিরশিল্প ইত্যাদি থেকে সরে বৈচিত্র্যময় পেশার দিকে যাচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী চাষাবাদে অনেকেরই যেমন আগ্রহ কম তেমনি তাদের চাষাবাদের জন্য ভূমির পরিমাণও আগের মতো যথেষ্ট নেই। আগে তারা যেভাবে যেখানে খুশি সেখানে চাষাবাদ করতে পারতো বর্তমানে এসব জনগোষ্ঠী বন বিভাগের আইনি ব্যবস্থার কারণে আর খাস জমিগুলো ইচ্ছেমতো ভোগদখল করতে পারছে না। বর্তমান প্রজন্মের মাঝে সরকারি বেসরকারি চাকরির সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ততা বাড়াচ্ছে।

পুরুষের পাশাপাশি নৃগোষ্ঠীর নারীরাও বিভিন্ন পেশায় জড়িয়ে পড়ছে। পাবলিক পরিসরে বিভিন্ন পেশায় পুরুষের সম্পৃক্ততা মোটামুটি সবাই সাদরে গ্রহণ করলেও নারীদের জড়িয়ে পড়ার বিষয়টিকে বেশিরভাগ প্রবীণ ইতিবাচকভাবে দেখে না। গারো জনগোষ্ঠীর একজন প্রবীণ দাবি করেন, তার পরিচিত কয়েকজন নারী ঢাকা শহরের বিউটি পার্লারে কাজ করতে এসে বাঙালি পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনাগুলো যেহেতু তাদের সমাজে নিষিদ্ধ তাই মেয়েদের বিবাহের আগে বাড়ির বাইরে চাকরি করাকে সমর্থন করতে চায় না।

পেশার বৈচিত্র্যময়তার একটা বড় প্রভাব হলো ব্যক্তির পেশার ভিন্নতা আয়ের ভিন্নতা তৈরি করে এবং একইসঙ্গে ব্যক্তির সামর্থ্যের পার্থক্য দৃশ্যমান করে। ফলে পরিবারগুলো তাদের আদি পরিবার ব্যবস্থা 'যৌথপরিবার' প্রথা ভেঙে 'একক' পরিবার গঠনে আগ্রহী হচ্ছে এবং একই সঙ্গে পরিবারগুলোর মধ্যকার আর্থসামাজিক সমতার পরিবর্তে অসমতা তৈরি হচ্ছে। তাদের এই অসমতা তাদের নিজ সমাজ এবং বাইরের সমাজ উভয় পরিসরেই দেখা যায়। যার ফলস্বরূপ তারা নিজেদের সমাজের বাইরে প্রত্যেকে (ব্যক্তি/পরিবার) একই সামাজিক অবস্থান ধারণ করে না। বরং সমসাময়িক বৈশ্বিক চর্চায় তারাও আলাদা আলাদাভাবে ব্যক্তিসামর্থ্যের ভিত্তিতে বিবেচিত হয়। এই পরিবর্তনগুলোর ফলাফল হিসেবে যা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তা হলো নৃগোষ্ঠীদের জাতি পরিচিতি এখন আর 'সরল' থাকছে না।

মূলধারার সংস্কৃতির সঙ্গে ক্রমাগত সংমিশ্রণ ও পরিবর্তনের কারণে তাদের প্রথাগত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ লাভ করেছে। এই পরিবর্তনগুলো আবার সব ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে একরৈখিক নয়। বিশেষত সংখ্যায় গরিষ্ঠ এবং লঘিষ্ঠ নৃগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তুলনামূলক চিত্র আবার আলাদা হয়। চা বাগানগুলোতে এমন কয়েকটি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী রয়েছে (যেমন কৈরি, নুনিয়া), যারা বাগানের বাইরে বৃহৎ পরিসরে নিজেদের জাতি পরিচয় প্রকাশ না করে 'হিন্দু সম্প্রদায়' বলে পরিচিতি প্রদান করে। তারা দাবি করেন, বাইরের পরিবেশে তাদের সম্পর্কে বেশিরভাগ লোকই জানে না। আবার তাদের চেহারা চাকমা মারমাদের মতো স্বতন্ত্র নয়; বরং বাঙালিদের মতো। এজন্য তাদের কেউ আলাদা জাতি হিসেবে বিবেচনা করে না। তারা যদি নিজেদের আলাদা জাতি হিসেবে পরিচিতি দিতে চায় তাহলে তাদের বিবিধ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়।

এ ধরনের বিভিন্ন জটিলতা এড়ানোর জন্য তারা চা বাগানের বাইরে নিজেদের স্বতন্ত্র জাতি পরিচিতি তুলে ধরতে চায় না। জাতি পরিচিতির সংকট ও সুযোগ-সুবিধা চাকমা-মারমার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং কৈরি-নুনিয়ার মতো সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে একইরকম নয়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর মাঝে যারা সংখ্যায় গরিষ্ঠ তাদের জাতি পরিচিতির সংকট লঘিষ্ঠদের তুলনায় কম। আবার যারা সামাজিকভাবে উচ্চশ্রেণিতে বাস করেন, শিক্ষিত, চাকরিজীবী, অর্থসম্পদশালী তারা অন্যদের তুলনায় বেশি সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। জাতি পরিচিতি ও সংস্কৃতি পাবলিক পরিসরে তুলে ধরা এবং চর্চা এদের জন্য একইরকম নয়।

বাংলাদেশের এই নৃগোষ্ঠীগুলোর স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক চর্চাগুলো আর আগের মতো বজায় রাখতে পারছে না। তাদের জাতি পরিচিতি এবং সাংস্কৃতিক পরিচিতি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং পরিবর্তনকে নবীনরা যেভাবে গ্রহণ করছেন প্রবীণরা সেভাবে করছেন না।

লেখক: গবেষণা কর্মকর্তা (কৃষক ও শ্রমিক ডিভিশন), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ ট্রাস্ট

/এসএএস/এমএমজে/এমওএফ/

***বাংলা ট্রিবিউনে প্রকাশিত কোনও সংবাদ, কলাম, তথ্য, ছবি, কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার দণ্ডনীয় অপরাধ। অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করলে কর্তৃপক্ষ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (Unauthorized use of news, image, information, etc published by Bangla Tribune is punishable by copyright law. Appropriate legal steps will be taken by the management against any person or body that infringes those laws.)

টপ